দেবানন্দ সরকার

সমীরণ

সমীরণ আমার একদম ছেলেবেলার বন্ধু। সমীরণ অর্থ বাতাস। কিন্তু ও মৃদুমন্দ প্রবাহ নয়, ও হচ্ছে ঝঞ্ঝা। ভীষণ দুরন্ত, প্রচন্ড সাহসী। ক্লাশ ওয়ান থেকে ও সবসময় পেছনের বেঞ্চে বসত। আমি সবসময় প্রথম সারিতে। তবু আমাদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি গাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার কারণ হয়তোবা আমাদের স্বভাবের বৈপরীত্য। আমি শান্ত, স্থির, শ্রোতা। ও ফুঁসন্ত, ব্যস্ত, বক্তা। ও সারাদিনের দুষ্টামির গল্প আমার কাছে করত। আমার বিস্ময়, আমার চোখের মুগ্ধতা ওকে উৎসাহিত করত, উদ্দীপ্ত করত। ওর হাত ধরে আমি শৈশব আর কৈশোরের ক্রান্তিকালগুলো পার হয়েছি। সিগারেট খাওয়া শিখেছি, প্রথম প্লে-বয়ের সেন্টার-স্প্রেড-এর ছবি দেখেছি। স্কুল পালিয়ে নৌকায় ঘুরেছি। প্রচন্ড শাসনের মধ্যে, নিরন্তর পড়াশুনার চাপের মধ্যে বড় হওয়া আমার সামগ্রিক মানসিক বিকাশের, আমার বোধের পরিপূর্ণতার পেছনে সমীরণের প্রধান ভূমিকা ছিল।

সমীরণ বর্হিমুখী, যেকোনো দলের নেতা। ক্লাশ ফাইভ-সিক্স-এ পড়ার সময়ই পুলিশের সাথে পাড়ার ছেলেদের মারামারিতে একদম সামনে গিয়ে ঢিল ছুঁড়ত। আবার ব্যাটনের আঘাত এড়িয়ে ফাঁক গলে পালিয়েও আসত। পাশের পাড়ার সাথে মারামারিতে ওকে কেউ কোনদিন অনুপস্থিত দেখেনি। খেলাধূলা করত খুব ভালো। ফুটবল, ক্রিকেট। ওর মুখাবয়ব সুদর্শন না হলেও ওর সুস্বাস্থ্য, লম্বা গড়ন, কোঁকড়ানো চুল ওকে যেকোনো দলের মধ্যমণি করে রাখতো। বিকেলে মেয়েদের স্কুলের পাশে যখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম তখন লজ্জাবনতা কিশোরীরা আড়চোখে লুকিয়ে মুগ্ধতায় সমীরণকে দেখতো।

আমি ছবি আঁকা শিখতাম ছোটবেলা থেকে। ওই প্রতিষ্ঠানে গান-নাচ-আঁকা সবই শেখানো হত। যখন ক্লাশ টেনে পড়ি তখন হঠাৎ সমীরণ ভর্তি হল গান শিখবে বলে। আসলে ওর উদ্দেশ্য গান শেখা ছিল না, মহুয়া নামের একটা মেয়েকে পথে দেখে ওর খুব ভালো লেগেছিল। মহুয়া গান শিখতো আর সমীরণ চেষ্টা করতে থাকল মহুয়ার কাছাকাছি আসার। মহুয়াকে দেখে আমার মনে হয়েছিল উন্নাসিক। ও খুবই সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের। আমার মনে হয়নি সমীরণের মতো কুখ্যাত ছেলের দিকে ও দ্বিতীয়বার তাকাবে। কিন্তু সমীরণের ব্যক্তিত্বে সম্মোহন ছিল। মহুয়া সমর্পণ করলো সমীরণের কাছে। গানের ক্লাশে না গিয়ে সিঁড়ির পেছনে বসে ওরা গল্প করত। একদিন ওদেরকে চমকে দেবার জন্য পা টিপে টিপে উঁকি মেরে খুঁজে পেলাম গাঢ় আশ্লেষে চুম্বনরত অবস্থায়। আমি পালিয়ে এলাম দৌড়ে। নিজেকে খুব অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছিল, ধিক্কার হচ্ছিল নিজের অভিজ্ঞতাহীনতায়।

সেটা মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির সময়। সমীরণ যখন পৃথিবীর রঙ-রসের আকণ্ঠ স্বাদ নিচেছ আমি তখন দরজা বন্ধ করে দিনরাত বই-এর মধ্যে ডুবে আছি। সমীরণের সাথে আমার যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ও মাঝে মাঝে আসত নোট নিতে, সাজেশন নিতে। মা-র কড়া চাহনির উপস্থিতিতে আমি ওর সাথে গল্প করতে পারতাম না। ও যা চাইত তা সাথে সাথে দিয়ে বিদায় করতাম আর পড়ার টেবিলে নিজেকে বেঁধে রাখতাম। সেই সময় থেকেই সমীরণের সাথে আমার বন্ধুত্বের প্রথম পর্যায়টা শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষা শেষে আমি মার সাথে চলে গেলাম দাদুর বাড়িতে। রেজাল্ট বের হলে আমি সহজেই ভর্তি হতে পারলাম সবচেয়ে ভালো কলেজে আর দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া সমীরণ একটা অখ্যাত কলেজে নিজের নাম জুড়ে রাখল।

নতুন কলেজে নিজের পড়াশুনার চাপে আর নতুন বন্ধুদের মায়ায় আমি পুরোপুরি ডুবে ছিলাম। সম্পর্কের পুরোনো সুঁতোগুলো আমাকে খুব একটা টানতো না। মাঝে মাঝে অন্য বন্ধুদের কাছ থেকে সমীরণের খবর পেতাম। ও ছাত্র-রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মিটিং-মিছিল করছে। বক্তৃতা দিচ্ছে। ওর যা কারিশমা ছিল তাতে সহজেই নেতৃত্বের প্রথম সারিতে স্থান হল ওর। আমাদের কলেজে ছাত্র-রাজনীতি ছিল ভীষণ দুর্বল, সবাই পড়াশুনায় ব্যস্ত ছিল, এর বাইরে অন্য কিছু করার সুযোগ ছিল না। তবু একদিন দেখলাম সমীরণ আর তার বাহিনী আমাদের কলেজে এসেছে দলের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে। আমি দূর থেকে দেখলাম ক্যান্টিনে বসে ওরা কথা বলছে। আমি সরে এলাম সেখান থেকে, সমীরণের সাথে দেখা করলাম না। কে যেন ভেতর থেকে আমাকে সর্তক করে দিল সমীরণের সাথে মিশলে রাজনীতির প্রবাহে আমি ভেসে যাব, নিজের পড়াশুনা আর হবে না।

কিছুদিন পর হঠাৎ এক সকালে সমীরণ বাড়িতে এল। উস্কখুস্ক চুল, চোখের নীচে কালি। বলল, "দোস্ত, রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি। এখন পড়াশুনা শুরু করেছি।"

"তাই নাকি? খুব ভালো খবরতো!" আমার খুবই ভালো লাগলো শুনে।

সমীরণ বলল, "বইপত্র তো কিছু কিনিনি। সামনের সপ্তাহে কতগুলো পরীক্ষা আছে। আমার হাতে এখন বই কেনার টাকা-ও নেই। তোর বইগুলো সপ্তাহ দুয়েক-এর জন্য ধার দিবি?"

আমি বললাম, "বইগুলো তো আমারও লাগবে। আমার কতগুলো বইয়ের পুরোনো এডিশন আছে সেগুলো তোকে দেই।" সমীরণ বলল, "তোর তো পড়া হয়েই গেছে। তুই বরং পুরোনো এডিশনের বইগুলো রাখ। আমাকে নতুনগুলো দে। সামনের মাসে পরীক্ষা শেষ হলে তোকে আবার ফেরত দেব।"

আমি না করলাম না। বইগুলো নিয়ে সমীরণ হারিয়ে গেল। ওর কোনো খোঁজই আর পেলাম না। ভাবলাম পরীক্ষার জন্য দরজা বন্ধ করে পড়াশুনা করছে। দু' মাস পার হয়ে গেল, বইগুলো নিয়ে সমীরণ এল না। পুরোনো বন্ধুদের কাছে গেলাম খোঁজ নিতে। ওরা হেসে বলল, "তুই জানিস না? ওতো বইগুলো নিয়েছে নীলক্ষেতে পুরোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করতে। ড্রাগ-মানি। আমরা সবাই ওর শিকার।" আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত সমীরণ ড্রাগ ধরল? ওর জন্য একই সাথে আমার ভীষণ রাগ আর সহানুভূতি হল। ইচ্ছে হচ্ছিল এই গহ্বর থেকে ওকে টেনে তুলি কিন্তু আমার ব্যক্তিত্বে সেই শক্তি, স্থৈর্য বা সাহস কোনোটাই ছিল না। আমার পরিচিতির পরিধি থেকে সমীরণ পুরোপুরি মুছে গেল।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল আর্ট কলেজে পড়ার কিন্তু আমার বাবা-মার ইচ্ছে আমি প্রকৌশলী হই। দু'য়ের মাঝে একটা সমঝোতা করে আমি ভর্তি হলাম স্থাপত্যে। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় যখন নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে এল তাদের মাঝে আবিস্কার করলাম মহুয়াকে। মহুয়া আরো অনেক সুন্দর, আরো অনেক ঝলমলে, দীপ্তিমতি হয়েছে। আমি বললাম, "আরে তুমি এখানে?" মহুয়া বলল, "আমি ভর্তি হয়েছি।" আমরা অনের পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করলাম। কিন্তু খুব সচেতনে এড়িয়ে গেলাম সমীরণের প্রসঙ্গ। আমার বন্ধুরা এই অসাধারণ সুন্দরীর সাথে আমাকে গল্প করতে দেখে ভীষণ ঈর্ষান্বিত হল। আর গর্বে আমার বুকের ছাতি ফুলে উঠল।

মহুয়া প্রায়ই আমার কাছে আসতো নোট নিতে, ড্রয়িং-এ, মডেল বানাতে সাহায্য নিতে। ক্যাম্পাসে আমার সাথে ওর সবচেয়ে বেশী যোগাযোগ ছিল। আমাদের মধ্যে প্রেম হওয়ায় কোনো বাধা ছিল না কিন্তু দু'টো কারণে তা হয়নি। প্রথম কারণ মহুয়ার আগমনের আগে থেকেই তনিমার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমার চেতনায় সমীরণের সাথে মহুয়ার চুম্বনরত ছবিটা স্পষ্ট, ঝকঝকে ছিল। আমার আর মহুয়ার মাঝে সমীরণ সব সময় একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরী করে রাখতো। আমরা খুব বেশী অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে পারতাম না। কাজের বিষয় নিয়ে আমরা অনেক কথা বলতাম কিন্তু তার বাইরে নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারতাম না।

আমি, রুদ্র, তনিমা আর রবীন, আমাদের চারজনের গ্রুপ ছিলো ড্রয়িং আর স্ট্রাকচার ক্লাশের। কাজ করতে করতে আমাদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল যার জের হিসেবে তনিমা হয়েছে আমার জীবনসঙ্গিনী। রুদ্র আর রবীন রাজনীতিতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল, আমি ঝাপসাভাবে। আমরা যখন একসাথে কাজ করতাম মাঝে মাঝে মহুয়া আসত, আমাদের কাজ দেখত, শিখত। এই আসা-যাওয়ার মাঝে রুদ্র গভীরভাবে মহুয়ার প্রেমে পড়ল। তনিমার সাথে যে আমার স্থায়ী সম্পর্ক হয়েছে সেটা রুদ্র আর রবীন তখনো জানতো না। রুদ্র ভাবছিল আমি মহুয়ার প্রেমিক আর সেই যন্ত্রনা ওকে উদভ্রান্ত করছিল। ও খুব সহজেই অধৈর্য হয়ে যেত, কথা বলত না, পড়াশুনার চেয়ে সারাদিন রাজনীতিতে মগ্ন থাকত। ওর ভেতর থেকে সমস্ত অনুভূতি একদিন তনিমা টেনে বের করল রুদ্রকে একা পেয়ে আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পরল। রুদ্র যখন জানতে পারল যে এই নাটকে আমি ভিলেন নই তখন ও শ্বাস ফেলে বাঁচল। ও সমস্ত প্রয়াস নিবেদন করল মহুয়াকে আকর্ষণ করার পেছনে । তনিমা পরিপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে থাকল। তনিমার এই ভূমিকার পেছনে বন্ধুত্বের পাশাপাশি অবচেতনের আমার আর মহুয়ার সম্পর্কের কাঁটাটার ভূমিকা কতটুকু ছিল তা আমি জানি না।

সমীরণের সাথে মহুয়ার সম্পর্কের কথা আমি কাউকে বলিনি এমনকি তনিমাকেও না। এদিকে রুদ্রও মহুয়ার প্রতি ওর ভালোলাগার কথা আমাকে বলেনি। আমরা তথ্য-বন্ধুরতার মধ্য দিয়ে দিন পার করছিলাম। একদিন তনিমা ঝলমলে মুখ নিয়ে বলল, " এই জানো, রুদ্রর সাথে মহুয়ার প্রেম হয়েছে।" খুবই আনন্দের সংবাদ কিন্তু অনেকদিন আগে দেখা একটা চুম্বনের স্মৃতি আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ভাসিয়ে রাখলো।

একদিন আমি, তনিমা আর রবীন বসে গল্প করছি। রুদ্র আর মহুয়া কোনো নিবিড় আড়ালে মগ্ন হয়ে আছে। ক্যান্টিনের ছেলেটা এসে বলল, " রুদ্রসাররে কে জানি খুঁজে।" এর কিছুদিন আগে ক্যাম্পাসে দুই বিরোধী দলের ছোটখাট উত্তেজনা হয়েছে। রবীন ভাবলো এর জের হয়তো। ও জিজ্ঞেস করল, " তুই লোকটাকে চিনিস?"
" না, কোনোদিন দেখি নাই। বাইরের লোক।" ক্যান্টিনের ছেলেরা সবাইকে চেনে, ভেতরের, বাইরের, দলের, বিপক্ষের। ওরা কাউকে না-চেনা মানে সত্যিকারের বাইরের কেউ। রবীন বলল, " দাঁড়া, আমি দেখছি।"

রবীন যখন ফিরল তখন রাগে ওর মুখ লাল হয়ে আছে। "আস্পর্ধা!" দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও।
"কি হয়েছে বল না?" আমরা জিজ্ঞেস করলাম।
"আমি গিয়ে বললাম আমি রুদ্র। কি হয়েছে বলেন। লোকটা কালো সানগ্লাস পরা ছিল। ক্রু-কাট চুল, দেখে মনে হয় আর্মিতে আছে। আমাকে ডেকে নিয়ে বসাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর জিজ্ঞেস করল আমার সাথে মহুয়ার কি

সম্পর্ক। আমি যখন জানতে চাইলাম তাদিয়ে ওর কি দরকার, ও খুব ঠান্ডা গলায় বলল মহুয়ার সাথে আমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে কেননা মহুয়া ওর। আমি কোনো কথা না বলে উঠে আসতে চাইলাম। ও আমার হাত ধরে বসিয়ে দিল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, 'খুব সাবধান। প্রাণের মায়া থাকলে মহুয়ার দিকে আর এগুবেন না।' তারপর উঠে চলে গেল। একবার ভাবলাম ব্যাটাকে কষে ধোলাই দেই, দলের সবাইতো আশেপাশেই ছিল। কিন্তু প্রথমবারের মতো ওকে ছেড়ে দিলাম।"

আমার বুকটা হিম হয়ে গেল। সমীরণ ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে ওর অধিকার প্রতিষ্ঠায়। আমি বুঝতে পারলাম ঝঞ্ঝা-সংকুল দিন সামনে পড়ে আছে।

এক সন্ধ্যায় মহুয়া আমার বাড়িতে এল কান্নাভেজা চোখে, "আমাকে সাহায্য কর, প্লিজ।" ও বলল সমীরণের সাথে ওর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে কলেজে পড়ার সময়ই। সমীরণ যখন রাজনীতি আর ড্রাগ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন মহুয়াই সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। আর আচ্ছন্ন মস্তিষ্ক নিয়ে সমীরণের স্থৈর্য ছিল না সেই সম্পর্ককে উজ্জীবন করার। ও মাঝে মাঝে মহুয়াকে ফোন করত, ভিখিরির মত মহুয়াকে ডাকতো ফিরে আসার জন্য কিন্তু ড্রাগের মায়াজাল থেকে বের হয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে মহুয়ার সামনে দাঁড়ানোর মানসিক শক্তি তখন ওর ছিল না। তারপর প্রায় বছর দু'য়েক ওদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। এর মাঝে মহুয়া রুদ্রকে ভালোবেসেছে। এখন ধূমকেতুর মতো সমীরণ উদয় হয়েছে আবার। মহুয়াকে ফোন করে বলেছে, "জানো, আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি তোমাকে চাই।" মহুয়া বলেছে, "কিন্তু আমি তোমাকে চাই না। আমার জীবন অনেক বদলে গেছে।"

সমীরণ বলেছে, "কিন্তু তুমি তো আমার।"

"একদিন ছিলাম। এখন আর না। এখন আমি রুদ্রের।"

রুদ্র নামটা সমীরণের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। ও খুঁজে বেড়াতে লাগলো রুদ্রকে। রুদ্র ভেবে রবীনকে শাসিয়ে গেল একদিন। পথে মহুয়াকে দাঁড় করিয়ে বলল,"রুদ্রকে ছাড়। ফিরে আস আমার কাছে।"

মহুয়া আমার হাত চোখের জলে ভিজিয়ে বলল, "তুমি একমাত্র সমীরণকে চেন। আমাকে বাঁচাও ওর হাত থেকে।"

পরদিন তনিমা, রবীন আর রুদ্র আমাকে চেপে ধরল, "সমীরণকে তুই চিনিস আমাদেরকে বলিসনি কেন?" ওরা আমাকে বাধ্য করল সমীরণের মুখোমুখি হবার। আমি বললাম, "আমি যাব কিন্তু আমার সাথে রুদ্রকে যেতে হবে। সমীরণ কেমন তা ওর সরাসরি দেখা দরকার।"

একদিন রাতে রুদ্রকে নিয়ে সমীরণের বাড়ি গেলাম আমি। রুদ্রকে পরিচয় করিয়ে দিলাম রবীন বলে। সমীরণ আশ্চর্য হয়ে গেল, "তুই কোথা থেকে?"

"এখানে একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম তোর সাথে দেখা করে যাই।"

আমরা অনেকক্ষণ ছোটবেলার বিচিত্র অভিজ্ঞতা রোমন্থন করলাম। সমীরণ সত্যিই ড্রাগ ছেড়ে দিয়েছে। ওর শরীরের শক্তি, চোখের দীপ্তি আবার ফিরে এসেছে। ও এখন আবার সেই সমীরণ হয়ে এসেছে যাকে দেখলে কিশোরীরা অপলক তাকিয়ে থাকতো। রুদ্র চুপ করে আমাদের কথা শুনছিল। ওর উপস্থিতিতে আমি আর সমীরণ মহুয়াকে নিয়ে কোনো কথা বললাম না। আমি টের পাচ্ছিলাম সমীরণের প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে রুদ্র সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছে। ফিরে আসার সময় আমি সমীরণকে বললাম, "পারলে একটু বাসায় আসিস, তোর সাথে কথা আছে।"

ফেরার সময় রুদ্রকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন দেখলি সমীরণকে?"

রুদ্র বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "খুব ভাল লাগলো। ওর সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে ভেবে ভয় লাগছে।"

আমি বললাম, "যতক্ষণ মহুয়ার মন থেকে ও মুছে আছে ততক্ষণ তোর ভয়ের কিছু নেই। আমি চেষ্টা করব সমীরণকে দুরে সরিয়ে রাখার।"

সমীরণ পরদিনই আমার বাসায় এল। আমি বললাম, "কালকে কাকে নিয়ে গিয়েছিলাম তুই কি বুঝতে পেরেছিলি?"

"হ্যাঁ, ও রুদ্র।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুই কি চাস?"

আমি বললাম, "সমীরণ পেছনে যা হয়ে গেছে তাকে পেছনে ফেলে রাখ। মহুয়া তোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, ওকে এগিয়ে যেতে দে। ওকে মুক্তি দে।"

সমীরণ ভীষণ রেগে গেল, "তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু। তুই আমার সাথে বেঈমানী করছিস?"

আমি মাথা ঠান্ডা রেখে বললাম, "নারে দোস্ত, আমি তোর সাথে বেঈমানী করছি না। তোরা সবাই আমার বন্ধু। আমি এমন একটা কিছু চাইছি যাতে সবার ভালো হয়। আমি তো তোকে ছোটবেলা থেকে চিনি। আমি তো জানি তুই কত শক্ত মনের মানুষ! রুদ্র-মহুয়া অনেক দুর্বল, তুই প্রতিপক্ষ হলে ওরা কিছুতেই তোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। তুই জোর

করলে হয়তো মহুয়া আর রুদ্রের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারবি কিন্তু ভগ্ন মহুয়াকে নিয়ে তোর কি লাভ হবে, কি আনন্দ পাবি তুই? তুই একটু উদার হ', একটু স্বার্থহীন। তোর মনের জোর অনেক, তুই টলবি না।"

সমীরণ ঠান্ডা হয়ে এল। আমি ওর চোখে জল দেখলাম। "তুইতো জানিস মহুয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কত গভীর ছিল। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ছাদে ওকে জড়িয়ে শুয়ে থেকেছি আমি। জীবনে একটা ভুল করেছি কিন্তু সেই ভুল থেকে তো আমি বের হয়ে এসেছি। তুই জানিস না, আমি ছ'মাস জেলে ছিলাম পুলিশের সাথে মারামারির কারণে। সেই জেল খাটা আমার জন্য শাপে বর হয়েছে। আমি ড্রাগ ছাড়তে পেরেছি, নিজের জীবনকে মূল্যায়ণ করতে পেরেছি। ভালোবাসাকে সম্মান দিতে শিখেছি।" ও শার্টের হাত উপরে তুলে দেখাল, "দেখ, মহুয়ার নাম আমি আগুন দিয়ে আমার হাতে লিখে রেখেছি।" সমীরণের হাতে বড় বড় করে স্থায়ী লেখা রয়েছে মহুয়ার নাম।

"শুধু হাতে নয়, আমার মনেও মহুয়া স্থায়ী হয়ে আছে, আমি কি করে মুছি তাকে?"

আমি বললাম, "কিন্তু মহুয়াতো তোকে মুছে ফেলেছে, ওতো তোকে আর চায় না। তুই কেন ওকে জোর করে চাস?"

সমীরণ ক্রমাগত মাথা নাড়তে থাকল, "তুই বুঝবি না। আমার পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে না গেলে তুই বুঝবি না।"

এরপর বেশ কিছুদিন সমীরণের সাথে আমি আঁঠার মতো লেগে রইলাম। অনর্গল বোঝাতে থাকলাম ওকে। ও রেগে যেত, প্রচন্ড গালাগালি করত, মারত না যে কেন আমি জানি না। আমি কথা বলতাম, ওকে শান্ত করতাম। ও চলে যেত, আবার ফিরে আসত উন্মত্ত হয়ে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল ও। আমার যুক্তিগুলো গ্রহণ করল। আমি বুঝতে পারছিলাম ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার জয় হল। আমি ওকে বোঝাতে পারলাম। একদিন ও বলল, "আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু জানিস আমি এখনো ওকে স্বপ্নে দেখি। আমার অবচেতন ওকে ভুলতে পারে না। আমার কষ্ট হয় রে খুব।" সমীরণকে দেখে আমারও কষ্ট হতো। ও বাস্তবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সেই সাথে সমর্পিত হয়েছে ওর প্রাণখোলা হাসি, ওর চোখের আগুন, ওর বাঙ্ময়তা।

একদিন সমীরণ বলল, "আমি অ্যামেরিকা চলে যাচ্ছি রে। আমার মামা আছেন সিয়াটলে, ওখানে একটা কলেজে আমার ভর্তির ব্যবস্থা করেছেন।" পলায়নপর, আহত সমীরণকে দেখে আমার চোখ ভিজে এল। আমার সামনে দিয়ে পুরো ছেলেবেলা চলচ্চিত্রের মতো দ্রুত পার হয়ে গেল। শেষ হল সমীরণের সাথে সম্পর্কের দ্বিতীয় অধ্যায়।

এরপর আমাদের জীবনে এসেছে অনেক জটিলতা, অনেক অনাকাঙ্খিত উত্থান-পতন। আমি আর তনিমা বিয়ে করে ফেললাম ছাত্রত্বের শেষ বছরে। পরস্পরকে পরিপূর্ণভাবে পাবার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। তাছাড়া আমাদের পরিবারেরও অসম্মতি ছিল না। আমাদের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হল রুদ্র আর মহুয়াও। ওরা বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় রুদ্রের শরীরটা কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছিল না। ঠান্ডা লাগত, জ্বর হত। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'কাম-জ্বর'। ওর শরীরটা পুরোপুরি ভাল হচ্ছিল না কিছুতেই। ও কোনো চিকিৎসা করাচ্ছিল না। ওকে ডেকে বললাম, "সামনে বিয়ে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ খা, পুরো সুস্থ হ।" ওর সাথে আমিও গেলাম ডাক্তারের কাছে। ভালো করে দেখলেন ওকে, রক্তের পরীক্ষা করতে বললেন। তিনদিন পর রক্তের রিপোর্ট আনতে রুদ্রের সাথে আমিও গেলাম। রিপোর্ট খুলে আমাদের দু'জনের পৃথিবী দুলে উঠল। লেখা আছে ওর রক্তের কোষগুলো অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। এর মানে কি? রুদ্রের লিউকেমিয়া হয়েছে? ডাক্তার রিপোর্ট দেখে বললেন, "বেশী ঘাবড়াবেন না। এখনো আর্লি-স্টেজে আছে। চিকিৎসা শুরু হোক। আর এখন তো বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করে পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব।"

রুদ্রের চিকিৎসা শুরু হল কিমোথেরাপি দিয়ে। এ সময় মহুয়াকে নতুন রূপে আবিস্কার করলাম আমরা। ও নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করল রুদ্রের সেবায়। ও রুদ্রকে ভাসিয়ে রাখল ভালোবাসায়, আদরে, যত্নে। রুদ্র মহুয়াকে ঠেলে দিতে চাইত, বলত, "আমি অসুস্থ, আমাকে নিয়ে কি করবে তুমি?" মহুয়া আরো বেশী করে ওকে জড়িয়ে ধরত। ওদের বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছিল। মহুয়া কারো কথা শুনল না। ও বলল ঐদিনই ও বিয়ে করবে। ওর বলার মধ্যে এমন কঠিন দৃঢ়তা ছিল যে ওর বাবা-মা, রুদ্র, আমরা কেউ তার বিরোধিতা করার শক্তি-সাহস পেলাম না। এছাড়া রুদ্র চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিল, যখন বিয়ের সময় হল তখন ও পুরোপুরি রেমিশনে। সেই আনন্দের দিনে কোনো ছায়া, মলিনতা, ভয় ছিল না। আমরা প্রাণ খুলে নির্দ্বিধায় উৎসবের রং মাখলাম। শুরু হল রুদ্র আর মহুয়ার সংসার জীবন।

আমাদের ছাত্রত্ব শেষ হল কিছুদিন পরই। আমি আর তনিমা দেশ ছাড়লাম, আবাস নিলাম নিউ ইয়র্কে। রুদ্র দেশে রয়ে গেল কারণ মহুয়ার তখনো পড়া শেষ হয়নি। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এল। প্রবাসী জীবনের নিরন্তর সংগ্রাম আমাদেরকে জাগতিক অনেক আনন্দ, অনেক বন্ধন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিল। তবু খবর পেতাম বন্ধুদের। রুদ্র আর মহুয়ার ছেলে হয়েছে, বছর দু'য়েক পরে মেয়ে। খুব ভালো লাগত এ সমস্ত টুকরো খবরে।

একদিন রবীনের কাছ থেকে একলাইনের ই-মেল এল, "রুদ্র রিল্যাপ্স করেছে।" আমি জানতাম একদিন-না-একদিন এই অনিবার্য ঘটনাটা ঘটবেই কিন্তু তা সচেতনে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। রুদ্রকে নিয়ে যাওয়া হলো সিংগাপুরে

বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য। ও যখন ডোনরের জন্য অপেক্ষা করছিল তার মধ্যে ওর শরীর আর অসুখের কষ্ট সহ্য করতে পারল না। একরাতে সবার অগোচরে রুদ্র বিদায় জানাল এই পৃথিবীকে।

এর বছরখানেক পর আমরা দেশে গেলাম। দেখা হল মহুয়ার সাথে। ও চাকরি করে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চা দু'টোকে বড় করছে। কারো সাহায্য নেয় না। ওর সৌন্দর্যে, ওর লাবণ্যে কোনো মালিন্য আসেনি। তার সাথে যোগ হয়েছে ঋজুতা, মানসিক শক্তি, সাহস। ও বলল, "রুদ্র ওর সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনোবল আমাকে দিয়ে গেছে। আমি এখন আর কিছু ভয় পাইনা।"

আমি বললাম, "নতুন করে জীবন শুরু করা যায় না?"

"নারে ভাই, রুদ্রের ভালোবাসা এখনো আমাকে আগলে রেখেছে। আমার আর নতুন ভালোবাসার প্রয়োজন নেই। আর রুদ্রের মতো করে কে ভালোবাসবে আমার বাচ্চাদেরকে? একটা নতুন সম্পর্কের টানাপোড়েনে পড়ে ওরা কষ্ট পাক তা আমি চাইনা।"

এরপর অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আমাদের সবার জীবন একই গড্ডলিকায় ভেসে যাচ্ছে। কোনো ঝঞ্ঝা নেই, কোনো কাঁপন নেই। আমরা নিজেদের গন্ডীতে ছোট ছোট পায়ে উপরে উঠছি। খবর পাই মহুয়া খুব ভালো চাকরি করছে, ওর ছেলে-মেয়ে খুব ভালো হয়েছে পড়াশুনায়। দূর থেকে শুনে খুব ভালো লাগে। কিন্তু জীবনতো এতো নির্বিরোধে, এত স্থিতিশীলতায় পার হতে চায় না। তার যে চলার জন্য আন্দোলন চাই, কম্পন চাই। প্রকৃতি ঘটনায়-দুর্ঘটনায় মন্থিত করে জীবনকে।

অফিসের কাজে মাসখানেকের জন্য গিয়েছিলাম শিকাগোয়। এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু নাফিসের সাথে। ও ধরে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে, বলল পরদিন সকালে হোটেলে পৌঁছে দেবে। আমেরিকা আসার পর নাফিস অনেক রক্ষণশীল হয়ে গেছে। ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছে, স্থান দিয়েছে প্রধান চিন্তায়। ওর স্ত্রী বোরখার আড়ালে ঢেকে রাখে নিজেকে, মেয়েরা ইসলামী স্কুলে যায়। আর ও সমগ্র অবসর কাটায় মসজিদে, মিলাদে, মাহফিলে। এই নাফিসকে আমি চিনতাম না। একটা বড় ধরণের ধাক্কা খেলাম বিশেষতঃ যখন ধর্মের অনুশাসন আমাকে চালিত করে না। ও ঘুরে ফিরে কি করে পূণ্যের পথে আসা যায়, কি করে পৃথিবীতে ধর্মের জোয়ার বইয়ে দেয়া যায় তার আলোচনায় চলে আসছিল। আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলাম ওকে বলতে এসব আলোচনা ভালো লাগছে না, আমি বিরক্ত হচ্ছি। ও তবু জোর করে আলোচনা করতে চাইল। একটা তিক্ত, শ্বাসরোধকর আবহাওয়া তৈরী হলো আমাদের মাঝে।

শিকাগোর অফিসে আমার কলিগ ছিল একটা চৈনিক মেয়ে। আমরা দুপুরে একসাথে খেতে যেতাম। নানা বিষয়ে গল্প বলতে বলতে ও জানাল যে ও কিছুদিন আগে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বোঝালো যীশুর মাহাত্ম্য। ও বলল চীনের ধর্মহীন পরিবেশে বড় হওয়ায় সৃষ্টিকর্তার, ঈশ্বরের বোধটাই কোনোদিন ওর মধ্যে হয়নি। ওর সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ঈশ্বরের আদর্শকে অনুধাবন করায়। এখন ও নিজেকে পুরোপুরি নিবেদন করেছে ধর্মের সেবায়। প্রতিদিন ওর কাছ থেকে এই বাণীগুলো আমার শুনতে হত। ভদ্রতার খাতিরে আমি বাধা দিতাম না। শুধু মনে হত, "এবার হলোটা কি? শুধু দেখি ধর্মের জোয়ার চারদিকে!"

শণি-রবিবার কোনো কাজ ছিল না। শুক্রবার রাতে একটা গাড়ি রেন্ট করে রওয়ানা দিলাম আইওয়া সিটিতে রবীনের ওখানে। শিকাগো শহরটা পার হতেই শুরু হল গ্রাম, ক্ষেত, মিডওয়েস্টের বিখ্যাত ফার্মল্যান্ড। রেডিওতে বাজতে থাকল শুধু কান্ট্রি মিউজিক আর ধর্মসঙ্গীত। মনে মনে আবারো বললাম, "হলোটা কি?"

রবীন এসেছে অল্পকিছুদিন হল। ডিভি ভিসায়। ও বিয়ে করেনি। হয়তো রুদ্র-মহুয়ার জীবনের গতি-পরিণতি ওকে বিবাগী করেছে। একটা ছোট ফার্মে কাজ করে ও। ওর সাথে দেখা হয়ে ভীষণ ভালো লাগল। সারারাত গল্প করলাম আমরা। হাসলাম, কাঁদলাম। ওকে যখন এবার ধর্ম নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম ও হাসল। বলল, "তোকে আগামীকাল আরো একটা ডোজ দিব।"

পরদিন ও আমাকে নিয়ে গেল ফেয়ারফিল্ড, আইওয়ায় মহাঋষি ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্টে। সাড়ে সাত হাজার একর জুড়ে বিশাল আয়োজন! বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় যোগ-উপাসনা, আছে হাসপাতাল যেখানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করা হয়। মহর্ষি প্রায় ত্রিশ বছর আগে নামমাত্র মূল্যে আইওয়ার ভূট্টার ক্ষেতে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আজ তা গমগম করছে প্রাচ্যের দর্শনে নির্বাণের আশায় মুমুক্ষু আর্যদের পদচারণায়। এর কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে বেদিক সিটি, পৃথিবার শান্তির রাজধানী। ওদের নিজস্ব আইন আছে, আদালত আছে, মুদ্রা আছে। এক "রামা" হচ্ছে দশ ডলার যা দোকানে, রেস্টুরেন্টে আইনতঃ ব্যবহার করা যায়। আমি মানলাম যে এবার আমার ধর্মীয় মগজধোলাই-এর কোটা পূর্ণ হল।

সুভেনির শপ-এ গিয়ে জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। কাউন্টারে গেরুয়াবসন, শ্মশ্রুমন্ডিত এক ভদ্রলোক ছিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। দাম দেওয়ার সময় ক্রেডিট কার্ডে আমার নামটা দেখে

বললেন,"আমার চিনতে ভুল হয়নি তাহলে?" তারপর পরিস্কার বাংলায় বললেন, "আমাকে চিনতে পারিসনি তুই?" আমি চমকে উঠলাম গলার স্বর শুনে, বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম ঐ চোখ দু'টোর দিকে। সমীরণ! ও এখানে কি করছে?

সেদিন রবীনের সাথে আর বাড়ি ফেরা হল না। আমি থেকে গেলাম সমীরণের আখরায়। সারাদিন সারারাত আমরা কথা বললাম। গল্প করলাম। আমি সমীরণকে বললাম, "আগে তোর গল্প বল, তারপর আমার কথা বলব।" সমীরণ বলল, "তুইতো জানিস আমি জেলে ছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা আমার পুরো চিন্তার ধারাটাকেই বদলে দেয়।" তখন অনেক বুদ্ধিজীবী জেলে ছিলেন রাজনৈতিক কারণে। ওদের সংস্পর্শ, ওদের বোধের আলো সমীরণের মাঝে আলোড়ন তোলে। ও জীবনকে, সম্পর্ককে, ভালোবাসাকে মূল্যায়ণ করতে শেখে। ও ভেবেছিল জেল থেকে বের হয়ে ভালো হয়ে যাবে, পড়াশুনা করবে, মহুয়ার সাথে ছিন্ন সম্পর্ককে জোড়া লাগাবে। ও ভাবতে পারেনি মহুয়ার কাছ থেকে ও বাধা পাবে। ওর ভেতরে তুমুল দ্বন্দ্ব হচ্ছিল। একদিকে ও চাইছিল সুন্দর একটা জীবন গড়তে, অন্যদিকে মহুয়ার প্রত্যাখান ওকে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ করে তুলছিল। আমেরিকার একাকী বন্ধুহীন পরিবেশে ও আরো বেশী উন্মনা, আরো বেশী উদভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিল। এমনি সময় ওর সাথে পরিচয় হল ডেভিড লারাবীর। বিশ বছর আগে মহর্ষির কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে হয়েছেন 'মুক্তানন্দ মহারাজ'। গেরুয়া বসন, সফেদ চুল-দাঁড়ি, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। মুক্তানন্দজীকে দেখলে অবাক-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। মুক্তানন্দজী সিয়াটলে এসেছিলেন বাবার শেষকৃত্যে। সমীরণকে খুঁজে পেলেন পাবলিক লাইব্রেরীর সিঁড়িতে চুপ করে বসে থাকতে। সমীরণের বসার ভঙ্গীতে, ওর দৃষ্টিতে হয়তো কিছু ছিল যা মুক্তানন্দজীকে সংকেত জানাল এই ছেলেটার সাহায্য চাই। তিনদিন সমীরণ মুক্তানন্দজীর সংস্পর্শে ছিল। সমীরণ শিখল কি করে সংসারের মাঝে, পৃথিবীর জীবনযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত থেকেও সমস্ত কলুষতার উর্দ্ধে ওঠা যায়। ওর বিক্ষিপ্ত মন এই আলোর রশ্মিটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। কলেজ শেষ করে ও সাথে সাথে চলে এল আইওয়ায় মুক্তানন্দজীর কাছে। তখন থেকে ও এখানেই আছে। অর্থনীতি পড়ায়, অবসরে মানবসেবা করে। গ্রীষ্মের ছুটিতে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় দুঃস্থের সেবায়। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম ওর গল্প শুনে। ভাবলাম সমীরণের পক্ষেই সম্ভব এই আমূল পরিবর্তনের। ও বলল, "দেখ, আমি ধর্ম প্রচার করি না। ধর্মের দর্শন থেকে ছেঁকে আমি মানবধর্ম পালন করি। আমি মানুষের সেবা করি। আমি প্রার্থনা করি না। মানুষ আমার ঈশ্বর। আমি এখানে থাকি কারণ এখানে থাকার জন্য আমার নামমাত্র খরচ লাগে। বাকী যা আয় করি সব বিলিয়ে দেই শিশুদের চিকিৎসায়, শিক্ষায়। আমার বাঁচতে ভালো লাগে, জীবনকে পরিপূর্ণ মনে হয়।"

আমি যখন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ওর কথা শুনছিলাম তখন ও জানতে চাইল আমার খবর। আমার জীবনকাহিনী পাঁচ মিনিটেই শেষ হয়ে গেল। খুব সাদামাটা, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধের গল্প। সমীরণ জানতে চাইল বন্ধুদের কথা। আমি ওকে খুলে বললাম রুদ্র আর মহুয়ার কথা, রুদ্রের প্রয়াণ, মহুয়ার একাকী জীবনযুদ্ধের কথা। সমীরণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। চাদরের ভেতর থেকে হাতটা বের করে বলল, "দেখ, মহুয়ার নামটা এখনো আমার হাতে লেখা আছে। এত ওলট-পালট হয়েছে জীবনে তবু ওকে আমি ভুলিনি। আমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসিনি আর। মনে হয় এখনো আমি মহুয়াকে ভালোবাসি। আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই কিন্তু দেশে কখনো যাইনি। আমার মনে হয়েছে দেশে গেলে অতীত আমাকে আবার অশান্ত করে তুলবে।"

বাকী যেটুকু সময় আমরা একসাথে ছিলাম সমীরণ গুটিয়ে গেল শামুকের মত। টুকটাক কথা হচ্ছিল কিন্তু আমি টের পাচ্ছিলাম সমীরণের মনটা অন্য কোথাও, অন্য পরিধিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি চলে এলাম পরদিন। কিছুদিন পর ফোন করলাম সমীরণকে। ও কথা বলছিল কিন্তু ওর কণ্ঠে উৎসাহ ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে অতীত এসে নাড়া দিক তা ও চাইছে না। ওর সাথে আমার যোগাযোগ আবার হারিয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন পর মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল ফোনের তারস্বর শব্দে। কলার আই. ডি.তে যখন কোনো নম্বর উঠলো না বুঝলাম ফোন এসেছে দেশ থেকে। ফোনটা তুলে ধরে 'হ্যালো' বলতে একটা কান্নাভেজা কণ্ঠ ভাঙা গলায় আমায় চাইল। আমি নিজের পরিচয় দিতে বলল, "আমি মহুয়া।" অনেক অনেকদিন মহুয়ার সাথে আমার যোগাযোগ নেই। খুব অবাক হলাম। "কি ব্যাপার মহুয়া, কেমন আছো?"

"আমাকে বাঁচাও।" অনেকদিন আগের এক সন্ধ্যায় মহুয়ার আর্ত আবেদন আমার অনুভূতিতে প্রতিধ্বনিত হল। মহুয়ার সংকটে আমি যেন আশ্রয়।

"কি হয়েছে মহুয়া?"

"সমীরণ ফিরে এসেছে।" সমীরণ ফিরে এসেছে দেশে মহুয়ার কাছে। ও বলেছে ও নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মহুয়ার সন্তানদের পিতৃস্নেহ দিয়ে আগলে রাখবে। মহুয়াকে ভালোবাসবে। ওদের সুন্দর সংসার হবে।

মহুয়া বলল, "সমীরণ আমাকে অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কিন্তু আমে যে ভীষণ ভয় পাই। আমি যাদেরকে ভালোবাসি তারা কেউ ভালো থাকে না। আমাকে ভালোবাসতে বাসতে সমীরণ একবার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমাকে ভালোবেসে রুদ্র পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। আমি কি করে স্বপ্ন দেখি বল? জীবনের কঠিন বাস্তবতার সাথে আমি অভ্যস্ত

হয়ে গেছি। আমার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, আমরা তিনজন মিলে জীবনে একটা ছক করে ফেলেছি। সেই ভারসাম্যে নাড়া লাগলে তার ফল কি হবে আমি জানিনা। আমি বুঝি না ওরা সমীরণকে কিভাবে নেবে।"

আমি বললাম, "মহুয়া তুমি কি সমীরণকে চাও?"

"আমি জানিনা জানো। ও একবার আমার পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। ওর ওপর আস্থা রাখতে ভয় হয়।"

"কিন্তু সমীরণতো এখন অনেক বদলে গেছে?"

"এটাইতো সবচেয়ে বড় ভয়। ও খুব সহজে বদলাতে পারে। ওর মনের জোর অনেক। ওযে আবারো বদলাবে না, গৃহের বাঁধনে পড়ে ওর মন যে আবার বাণপ্রস্থ চাইবেনা তা কে জানে?"

আমি মহুয়াকে কি পরামর্শ দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার পাশে শুয়ে তনিমা সব শুনছিল। ও ফোনটা নিয়ে বলল, "মহুয়া তুমি কি সমীরণকে মাসখানেক ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? আমরা তো সামার-এ দেশে যাব তখন আমি সমীরণের সাথে কথা বলে দেখবো।" মহুয়া রাজী হল তাতে। আমি শুধু যোগ করলাম, "মহুয়া নিজের মনকে ভালো করে প্রশ্ন করে দেখ, তুমি কি চাও।"

একমাস পর দেশে এয়ারপোর্টে যখন পা রাখলাম, অনেক লোক এলো আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে। তাদের ফাঁক গলে দেখতে পেলাম দূরে সমীরণ দাঁড়িয়ে আছে। সমীরণের মুখের প্রতিটি ভাঁজ আমার চেনা, তাই ওকে চিনতে পারলাম। না হলে অল্পপরিচিত হলে ওকে চেনাই মুশকিল হয়ে যেত। দাঁড়ি-গোঁফ উধাও হয়ে গেছে, চুল ছোট করে কাটা, পরনে টি-শার্ট আর কালো প্যান্ট। এযেন নতুন যৌবনের সমীরণ আবার ফিরে এসেছে। আমাদের দেখে এগিয়ে এল। বলল, "তোদের দেখতে এলাম। বাড়ি যা। পরে যোগাযোগ করব।"

জেট-ল্যাগে আমাদের ঘুম আসছিল না। পরদিন কাকভোরে আমি আর তনিমা হাঁটতে বের হলাম। তনিমা বলল, "চল, মহুয়ার বাসায় যাই।" আমরা যখন বেল টিপলাম তখনো ওরা ঘুম থেকে ওঠেনি। মহুয়া চোখ মুছতে মুছতে দরজা খুলে তনিমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল হাউ হাউ করে। "বলতো আমি কি পাপ করেছি, আমার জীবনে কেন শান্তি নেই, কেন খালি জটিলতা?"

ও বলল সমীরণ আবার ফিরে গেছে আগের জগতে যেখানে ও ভয়হীন, স্বাধীন, নিজের দাবীতে সোচ্চার। সমীরণ মহুয়াকে বলেছে, "তুমি কি বোঝ সব নিয়তি? তুমি আমার, শুধু আমার। তা না হলে আমার হাতে লেখা তোমার নাম কবেই তো মুছে যেত। আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে।" মহুয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি চাই না। আমার ছেলেমেয়েরা সমীরণকে পছন্দ করে না। কিন্তু সমীরণ আমাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয় না। বলে, 'আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখ আমি ওদেরকে আপন করবই।' কিন্তু আমি মা হয়ে কি ভাবে এই খেলায় মাতি?" তনিমা বলল, "আমরা কথা বলব সমীরণের সাথে।"

সমীরণের সাথে দেখা হতেই ও বলল, "আমি জানি তোরা কি বলবি? একদিন তোরা অনেক কথা বলে মহুয়াকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলি, সে সুযোগ আর তোদেরকে দেব না। আমি এবার মহুয়াকে নিজের করবই।" ওর চোখ দু'টোতে এমন কাঠিন্য ছিল যে আমরা কোনো কথা বলার সাহসই পেলাম না। তনিমা আমাকে বলল, "মহুয়া যদি একান্তই না চায় তাহলে মনে হয় আইনের সাহায্য নিতে হবে।"

সমীরণের কাছে মহুয়ার কাছ থেকে দূরে থাকার নোটিশ গেল। সমীরণ সেটা দোলাতে দোলাতে আমাকে বলল, "ভেবেছিস এই সামান্য কাগজ আমাকে আটকাতে পারবে? আমি এর থোড়াই কেয়ার করি।" ও টুকরো টুকরো করে কাগজটা ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল। সমীরণ এরপর অনেক চেষ্টা করেছে মহুয়ার সাথে যোগাযোগ করার। সফল হয়নি। মহুয়া ফোন ধরেনি। মহুয়ার বাড়ি গেছে, পুলিশ ঢুকতে দেয়নি। থানার ওসি, পাড়ার মাস্তানেরা সমীরণকে শাসিয়ে গেছে মহুয়ার নাগালে না আসার। সমীরণ আহত বাঘের মত ছটফট করেছে। আমার কাছে এসে বারবার বলেছে, "তুই একটু বল, তুই বললে ও শুনবে।" আমি বললাম, "তুই বোঝার চেষ্টা কর মহুয়া তোকে চায় না।"

আমরা ফিরে এলাম নিজের ডেরায়। ফেরার সময় সমীরণের কোনো খোঁজ পেলাম না। মহুয়াকে সাবধানে থাকতে বললাম, পরিচিত সকলকে বললাম মহুয়ার খোঁজ-খবর রাখতে।

একদিন একটা ই-মেল এল সমীরণের কাছ থেকে। লিখেছে ও ইন্দোনেশিয়ায় চলে এসেছে। একটা স্কুলে পড়ায়। থাকে সাগরের পাড়ে। আমাকে লিখল, "ভীষণ একা লাগে জানিস। ভালোবেসে প্রত্যাখাত হওয়ার জ্বালা যে কি ভীষণ তুই বুঝবি না। দিনে ক্লাশ নেই। বিকেলে বালির ওপর শুয়ে থাকি। সন্ধ্যা হয়, রাত নামে। আমি তারা গুনি।" আমার চোখদু'টো ভিজে এলো সমীরণের চিঠি পড়ে।

সেদিন রাতে টিভি খুলে দেখি প্রধান খবর ভয়াবহ ৎসুনামি। সমীরণ যেখানে ছিল সে জায়গাটা সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত। আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম সমীরণ ঋজু একাকী দাঁড়িয়ে আছে সৈকতে। বিশফুট উঁচু ঢেউ ছুটে আসছে ওকে গ্রাস করতে। ও হাসতে হাসতে প্রবল আগ্রহে জড়িয়ে ধরছে সেই ভয়ংকর ঢেউয়ের ফেনা।

দেবানন্দ সরকার
নিউ ইয়র্ক থেকে

ই-মেলঃ ds2039@columbia.edu